বাংলাদেশে গ্রন্থাগার উন্নয়ন ভাবনা

আলাউদ্দিন মল্লিক

গ্রন্থাগার

বৈজ্ঞানিক মতে, বর্তমান মানবজাতির ক্রমবিকাশের বয়স প্রায় ১০,০০০ বছর। সর্বপ্রথম ৪,০০০ থেকে ৫,০০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে গ্রন্থাগারের উৎপত্তি হয় মিশরের সুমেরীয় অঞ্চলে ও এশিয়া মাইনরে। সম্রাট আসুরবনিপাল কর্তৃক ৬২৫ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে বিশ্বের সর্বপ্রথম প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় মিশরের নিনেভে'তে। খ্রিস্টপূর্ব ১ম শতাব্দীতে চীনে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি জাতীয় গ্রন্থাগার। সে হিসেবে বিশ্বে গ্রন্থাগার গড়ে ওঠার বয়স আড়াই হাজার বছরের।

গ্রন্থাগারর সঙ্গে মানবজাতির সভ্যতা বিকাশের নিগূঢ় ও অন্তর্নিহিত বিষয় জড়িত। সভ্যতার বিকাশই হয়তো ঘটত না, যদি না প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের মধ্যে গ্রন্থাগার সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করত। স্বীকার করতেই হবে সভ্যতার বিকাশকে ত্বরান্বিত ও যুগ যুগান্তরে বিকশিত করেছে গ্রন্থাগার। বলাই বাহুল্য যে, বাংলাদেশের গ্রন্থাগার উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরার জন্য এই উপমহাদেশের সভ্যতা বিকাশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করা অপরিহার্য।

প্রায় ৪,০০০ থেকে ৫,০০০ বছরের প্রাচীন ইতিহাসের ক্রমধারায় বর্ণিত গ্রন্থাগারের বিকাশ নেহায়েৎ অকিঞ্চিৎকর নয়। ভারতবর্ষের গ্রন্থাগারের ইতিহাস অতি প্রাচীনকালের। গোড়া থেকেই অসংখ্য মন্দির, মসজিদ, গির্জা ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয়ে ও শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তিদের সংগ্রহে বিভিন্ন ধরন ও আকারের পুঁথি কিংবা গ্রন্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল।

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার উন্নয়নের সূচনা প্রায় ২,০০০ বছর পূর্বে। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে এই অঞ্চলের ময়নামতি ও মহাস্থানগড়সহ অন্যান্য বৌদ্ধ বিহারগুলোতে গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বিশেষত বৌদ্ধ বিহারের সেসব গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত উপকরণ থেকে জ্ঞান আহরণের জন্য নানান দূরদেশের জ্ঞান অনুসন্ধিৎসু মানুষের পদব্রজে আসা-যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। ৩৯৯ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে

বাংলাদেশে গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। এ-ছাড়াও হিউয়েন সাং সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে অধিকতর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানার্জনের জন্য এ অঞ্চলের বৌদ্ধবিহারে থাকা গ্রন্থাগারের সামগ্রী ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। উক্ত বিবরণ থেকে ভারত উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশের গ্রন্থাগার বিকাশের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়।

বাংলায় গ্রন্থাগারের প্রারম্ভ

সৃষ্টি ও সভ্যতা বিকাশের সহায়ক আদি বিদ্যাগুলোর মধ্যে একটি প্রাচীনতম অধিবিদ্যার অন্যতম বিদ্যা হচ্ছে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা। মানবদর্শন বাস্তবায়নের সঠিক দিক নির্দেশনা জ্ঞাপনে গ্রন্থাগারের বিকল্প নেই। একথা বলা অনস্বীকার্য যে, যখন থেকে মানুষের ভাবনা-চিন্তা ও চেতনার স্ফুরণ ঘটতে থাকে, তখন থেকেই সেগুলোকে সংগঠিত করা হয়। ইতিহাস পরিক্রমায় জ্ঞানচর্চা, জ্ঞান-বিন্যাস ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় গ্রন্থাগারের অগ্রগতি সভ্যতার ক্রমবিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে।

একটি গ্রন্থাগার যখন সংগঠিত হয় তখন সংগত কারণেই তার সংগ্রহ থাকে অল্প, চাহিদা থাকে সীমিত, কাজের পরিধিও থাকে কম। দিন যায়, প্রয়োজন বৃদ্ধি পায় এবং কাজের পরিধিও বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই সুবাদে প্রয়োজন ও সেবার চাহিদা বহুমাত্রিকতায় উন্নতি লাভের পাশাপাশি একটি গ্রন্থাগারের সংগ্রহও বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই এর সংগ্রহ থেকে পাঠককে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সঠিক সময়ে সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে পাঠোপকরণ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে গ্রন্থাগার সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি চলে আসে।

ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধ বিহারগুলোর প্রসার মূলত এদেশে জ্ঞান চর্চার গোড়াপত্তন করে প্রাচীন সভ্যতার বিকাশকে চলমান রেখেছে। এই সুবাদে দাবী করা যায় যে, বর্তমান বাংলাদেশে গ্রন্থাগারের সূচনা হয় প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে। কিন্তু যেকোনো কারণেই হোক বিকাশমান ধারাটি সেভাবে বিস্তার লাভ করতে পারে নি।

গ্রন্থাগার আন্দোলন: ব্রিটিশ আমল

ব্রিটিশদের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতায় ঊনিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূচনা হয়। ঊনিশ শতকের প্রথম দশকেই ভারতবর্ষের তিনটি প্রধান শহর কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় গণগ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। ত্রিশের দশকে এসময়ে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংয়ের ভারতবর্ষ ত্যাগ এবং লর্ড অকল্যান্ডের ভারতবর্ষে আগমনের মধ্যবর্তীকালে (মার্চ ১৮৩৫-ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬) স্যার চার্লস থিওফিলাস মেটকাফ এক বছরের জন্য অস্থায়ী বড় লাট নিযুক্ত হন এবং গ্রন্থাগার আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করে।

১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গে, ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন বোম্বাইয়ে এবং ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে

মুদ্রণযন্ত্রের স্বাধীনতা অপহরক আইনগুলো রদ করে সমগ্র ভারতেই মুদ্রণযন্ত্রকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ৩ আগস্ট এই আইনটি বিধিবদ্ধ হয়ে ১৫ সেপ্টেম্বর কার্যে পরিণত হয়। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২০ আগস্ট কলিকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় স্থির হয় যে, কলিকাতার কেন্দ্রস্থলে মেটকাফের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্থায়ী নিদর্শন স্বরূপ 'মেটকাফে লাইব্রেরী বিল্ডিং' নামে একটি ভবন নির্মিত হবে এবং এখানে সাধারণের জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হবে। এটাই মূলত পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হয় কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরিতে। গ্রন্থাগারের কাজ শুরু হলেও প্রকাশ্যভাবে এর উন্মোচন হয় ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ৮ মার্চ। এটাই ছিল অবিভক্ত বাংলার সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠিত প্রথম গণগ্রন্থাগার।

ব্রিটিশ ভারতে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম গণগ্রন্থাগার আইন পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ঠিক এর এক বছর পর ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে যশোরে বেসরকারিভাবে প্রথম একটি গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আইন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে গণশিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। সেই আদলে ভারতবর্ষেও তৎকালীন জমিদার, উমেদার, সমাজসেবী সরকারি কর্মকর্তা ও জনহিতৈষী ব্যক্তিদের উদ্যোগে গণশিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে একযোগে আরও তিন জেলা-সদর পর্যায়ে গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। সেগুলো হলো উডবার্ন পাবলিক লাইব্রেরি, যার সংগ্রহে ছিল ২৫,০০০টি গ্রন্থ, রংপুর পাবলিক লাইব্রেরি ও বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরি; এবং এই দুই লাইব্রেরির সংগ্রহ সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৯,৮০০ এবং ১৭,২০০টি গ্রন্থ। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দকে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার উন্নয়নের ইতিহাসে মাইলফলক হিসেবে গণ্য করা হয়। পর্যায়ক্রমে জেলা, মহকুমা ও কতক থানা পর্যায়ে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। ১৮৮৪ ও ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে রাজশাহী ও কুমিলা গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলে। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় নোয়াখালী ও সিলেট পাবলিক লাইব্রেরি।

গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি পূর্ববঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বেই বেশ কিছু কলেজ ও সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। যেগুলো ইতঃপূর্বেই ঐতিহ্যের শতবর্ষ উত্তীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা কলেজ (১৮৪১), জগন্নাথ কলেজ (১৮৪৪), রাজশাহী কলেজ (১৮৭৩), বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ (১৮৮৯), সিলেট মুরারিচাঁদ কলেজ (১৮৯২), পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ (১৮৮৯), কুমিলা ভিক্টোরিয়া কলেজ (১৮৯৯) অন্যতম।

এরই মধ্যে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে Press and Registration Book Act পাশ হলে গ্রন্থাগার আন্দোলনে গতিপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপের সূচনা হয়। এর পরে পর্যায়ক্রমে ১৮৭২-৭৬ খ্রিস্টাব্দের কোনো একসময় বুড়িগঙ্গার তীর ঘেঁষে ঢাকার বাংলাবাজারে ভারতবর্ষের গভর্নরের নামে নর্থব্রুক হল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন ঢাকায় গ্রন্থাগারটি শহরের অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে ওঠে। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে বরিশালের বানারীপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি, পাবনায় ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে আনন্দ গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরি এবং ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে খুলনায় উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৪ থেকে

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে আরও বেশ কিছু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে নাটোর ভিক্টোরিয়া পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৮৭), নীলফামারী পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৯১) এবং ভোলায় ওয়েস্টার্ন ডায়মন্ড জুবিলি গ্রন্থাগার ও ক্লাব (১৮৯৮) প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বিশেষত বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ধারাটি একটু গতিশীল হতে দেখা যায়। এর মধ্যে কুড়িগ্রাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরি (১৯০১), বন্দরনগরী চট্টগ্রামে বাকল্যান্ড পাবলিক লাইব্রেরি (১৯০৪), উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয় অনেক পরে (১৯৬৩); ব্রাহ্ম সমাজ কর্তৃক ঢাকার পাটুয়াটুলীতে প্রতিষ্ঠিত হয় পাবলিক লাইব্রেরি (১৯০৫), গাইবান্ধা পাবলিক লাইব্রেরি (১৯০৭), ঢাকা জেলা গেজেটিয়ারের অন্যতম লেখক ও মুন্সীগঞ্জের তৎকালীন জেলা মেজিস্ট্রেট বি.সি. এলেন মুন্সীগঞ্জে হরেন্দ্রলাল পাবলিক লাইব্রেরি (১৯০৮), নওগাঁয় প্যারীমোহন সমবায় পাবলিক লাইব্রেরি (১৯১০), লালমনিরহাট পাবলিক লাইব্রেরি (১৯১১), রাজশাহী বরেন্দ্র মিউজিয়াম রিসার্চ লাইব্রেরি (১৯১০), রাণীনগরপুর ও গুরুদাসপুর পাবলিক লাইব্রেরি (১৯১৫) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লার তৎকালীন সমাজসেবী শ্রী মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর মায়ের নামে 'রাম মালা গ্রন্থাগার' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা জাদুঘর লাইব্রেরি।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে তৎকালীন ভারত সরকার নিখিল ভারত গ্রন্থাগারিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে। তা ৪-৮ জানুয়ারি পর্যন্ত লাহোরে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও নেতৃস্থানীয় গণগ্রন্থাগারের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের মাধ্যমে আঞ্চলিক গ্রন্থাগার পদ্ধতি চালু করে ছোটো-বড় সকল গ্রন্থাগারের মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি সার্ভিস প্রবর্তনের জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। এটি একটি সাংবিধানিক কাযক্রম ছিল। তারপরেই ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের স্বায়ত্বশাসন আইন ১৯১৯-এ সংশোধিত হলো এবং জেলা বোর্ড ও পৌরসভার উপর অর্পিত হলো গ্রন্থাগারের দায়িত্ব। সমগ্র বাংলাদেশে সংঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে অল বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতবর্ষ বিভক্তির পূর্ব পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশে প্রায় সকল জেলাসদরে একটি করে পাবলিক লাইব্রেরি বিদ্যমান ছিল। এখনও সেগুলো কোনো না কোনোভাবে সরকারি কিংবা বেসরকারি লাইব্রেরি হিসেবে চলমান আছে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতিধারা ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ধাবমান ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে গতিধারায় কিছু শিথিলতা নেমে আসে। অন্যদিকে তার কিছুদিন পরেই হিন্দু-মুসলমান বিরোধের সূচনা হয়। এর ফলে উজ্জীবিত চাঞ্চল্যেও স্থবিরতা দেখা যায়। আন্দোলন বেশ পিছিয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন সরকার প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন করার ফলে সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারলাভ করার সুযোগ তৈরি হয়।

এর ফলে বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চা ব্যাপক প্রসারলাভ করে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বরিশাল ও পটুয়াখালী অঞ্চলে ৬১টি, বগুড়ায় ৩২টি, ঢাকা জেলায় ২৫টি, ময়মনসিংহ জেলায় ৩৯টি, ফরিদপুরে ২৩টি, রাজশাহীতে ৪৮টি, রংপুরে ২৬টি, নোয়াখালী ও সিলেটে যথাক্রমে ১৫ ও ২১টি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার খোঁজ পাওয়া যায়। এ-ছাড়াও বিক্ষিপ্তভাবে সরকারি ও বেসরকারি আরও ১২১টি গ্রন্থাগারের হিসেব পাওয়া যায় বিভিন্ন উৎস থেকে। বর্তমানে এর অনেকগুলোই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষে ৩৩৫টিরও বেশি বেসরকারি গণগ্রন্থাগারের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। স্থানীয় প্রভাবশালী জমিদার, উমেদার, সমাজহিতৈষী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বা পরিবার এই গ্রন্থাগারগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করে দীর্ঘকাল টিকিয়ে রেখেছিলেন।

পাকিস্তান আমল

ইউনেস্কোর পরামর্শে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান বিবলিওগ্রাফিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ (PBWG) গঠিত হয়েছিল। গ্রুপটি ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে পুনর্গঠিত হয়। ৬ জুলাই ১৯৫৪-এ অনুষ্ঠিত এর সভায় একটি জাতীয় সমিতি গঠনের জন্য একটি অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়। এইভাবে পাকিস্তান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (পিএলএ) ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ) প্রতিনিধি অ্যাডহক কমিটিতে ছিলেন যাঁরা করাচিতে 'অল পাকিস্তান অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দেন।

পূর্ব পাকিস্তানে তখন সম্পূর্ণ শূন্যতা। ঢাকা ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি ছিল একমাত্র লাইব্রেরি যা পূর্ব পাকিস্তানের অংশে পড়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ছিলেন খণ্ডকালীন গ্রন্থাগারিক। কয়েকটি সাবস্ক্রিপশন লাইব্রেরি–যেখানে অল্প কল্পকাহিনী রয়েছে তাকে পাবলিক লাইব্রেরি বলা হতো। আধা-সরকারি সংস্থা এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির ছোটো লাইব্রেরি ছিল। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি রাজধানী ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ অবস্থায় গ্রন্থাগার সমিতির অনুপস্থিতি প্রবলভাবে অনুভূত হয়। তাই ঢাকার সাত জন প্র্যাকটিসিং লাইব্রেরিয়ান ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে পলাশী ব্যারাকে একত্রিত হন এবং অ্যাসোসিয়েশনের গুরুত্ব এবং পূর্ব পাকিস্তানে গ্রন্থাগার পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জনপ্রিয় করার সংকল্প করেন। তারা হলেন জনাব এ.আর. মীরদাহ, জনাব এ.ই.এম. শামসুল হক, জনাব রাকিব হোসেন, জনাব সিদ্দিক আহমদ চৌধুরী, জনাব জামিল খান, খন্দকার আব্দুর রব এবং জনাব তোফাজ্জল হোসেন। তাঁদের প্রচেষ্টা পূর্ব পাকিস্তানে গ্রন্থাগার আন্দোলনে রূপ নেয়।

১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খণ্ডকালীন গ্রন্থাগারিক অধ্যাপক ড. নাফিজ আহমদকে আহ্বায়ক করে একটি অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়। জনাব আহমদ হোসেন, গ্রন্থাগারিক,

কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি, জনাব রাকিব হোসেন, গ্রন্থাগারিক, ইউএসআইএস এবং মিসেস নার্গিস জাফর, রেফারেন্স লাইব্রেরিয়ান, ইউএসআইএস গঠিত হয়। এদিকে, ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে মরহুম জনাব মোহাম্মদ সিদ্দিক খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক হিসেবে যোগদান করেন। যুক্তরাজ্য থেকে ফিরে এসে লাইব্রেরিয়ান হিসেবে যোগদানের পরপরই তিনি সমিতিতে যোগ দেন। জনাব খানের অন্তর্ভুক্তি এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ এই নবজাতক সমিতিকে একটি নতুন জীবন ও চেতনা দিয়েছে। জনাব আহমদ হোসেন, জনাব এ.আর. মীরদাহর সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি সংবিধান খসড়া উপকমিটি। মীরদাহ ও জনাব রাকিব হোসেন অচিরেই খসড়া গঠন করেন। তাদের সহায়তা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের পাঠক জনাব শামসুজ্জোহা আনসারী।

১৯৫৬ খিস্টাব্দে সেই সংবিধানের ভিত্তিতে ইস্ট পাকিস্তান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (ইপিএলএ) গঠিত হয়। রবিবার ৩০ জুন ১৯৫৭ তারিখে, ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিসেস (ইউএসআইএস) মিলনায়তনে নবজাতক সমিতির ঐতিহাসিক বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ঢাকা শহরের অধিকাংশ সদস্য গ্রন্থাগারিক উপস্থিত ছিলেন। অ্যাসোসিয়েশনের পদাধিকারীরাও নির্বাচিত হয়ে অ্যাসোসিয়েশনের আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যান। তখন থেকেই এই অঞ্চলে গ্রন্থাগার আন্দোলন আকারে ছড়িয়ে পড়ে। সরকারি উদ্যোগে বিভাগীয় পর্যায়ে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে বড় বড় শহরের পাড়া-মহল্লায় এটি ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। এমনকি বড় কিছু গ্রামেও এর প্রভাব দেখা যায়।

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল শিল্প, সাহিত্য, ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির লালনকেন্দ্র হিসেবে কাজ করা; দেশ ও জাতি সম্পর্কে দেশি-বিদেশি সকল প্রকাশনা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ করা; বৈধ গচ্ছিতকারী লাইব্রেরি হিসেবে কাজ করা; জাতীয় কেন্দ্র হিসেবে কাজ করা এবং সরকারের তথ্য পরিবেশন কেন্দ্র হিসেবে কাজ করা। জাতীয় গ্রন্থাগারের কার্যাবলী হলো দেশের সমস্ত পুস্তক, সরকারি প্রকাশনা ও সাময়িকী কপিরাইট আইনবলে সংগ্রহ করা এবং সংগঠন, সংরক্ষণ ও বিতরণ করা; বাংলাদেশ সম্পর্কে দেশের বাইরে প্রকাশিত পাঠোপকরণসমূহ সংগ্রহ, সংগঠন, বিন্যাস ও বিতরণ; জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়ন ও প্রকাশ করা; ইউনিয়ন ক্যাটালগ প্রস্তুত করা; পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা; আন্তঃগ্রন্থাগার সেবার সমন্বয় সাধন করা; দেশে বিদ্যমান গ্রন্থাগার সেবার সমন্বয় সাধন; আন্তর্জাতিক তথ্য বিনিময় কেন্দ্র হিসেবে কাজ করা; দেশে প্রকাশিত গ্রন্থ ও সাময়িকীর যথাক্রমে আইএসবিএন ও আইএসএসএন দেওয়া; সরকারকে তথ্যসেবা দেওয়া ইত্যাদি।

স্বাধীন বাংলদেশ

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার অব্যবহিত পরেই পূর্ব পাকিস্তান গ্রন্থাগার সমিতির পুনঃনামকরণ করে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (Bangladesh Librarz

Association, LAB) নির্ধারণ করা হয়। এরপর বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (IFLA) ও কমনওয়েলথ লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের (COMLA) স্বীকৃতি অর্জন করে সদস্য পদপ্রাপ্ত হয়।
১২ জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দেশ পুনর্গঠনে লেগে পড়েন সহযোগীদের নিয়ে। ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে বঙ্গবন্ধু স্বাক্ষর করেন। যুদ্ধকালে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে সংযুক্ত অসংখ্য গ্রন্থাগারসহ দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো পর্যুদস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সেসব বিবেচনায় নিয়েই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পরিকল্পনা গৃহীত হয় দেশ পুনর্গঠনের জন্য। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে বিশেষ করে ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে বঙ্গবন্ধুর ভাবনার সরকার এক দূরদর্শী ও সুদূর-প্রসারী মনোভাব নিয়ে ডক্টর কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করেন। কমিশনে যুগান্তকারী প্রতিবেদন পেশ করা হয় ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭২।

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার উন্নয়ন বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর লালিত ভাবনার যুগান্তকারী প্রতিফলন ঘটে কমিশনের প্রতিবেদনে। যার বাস্তবায়নে অনায়াসে পিছিয়ে থাকা যুদ্ধে ধ্বংসপ্রায় দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা সম্ভব বলে বঙ্গবন্ধু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাই বিবেচনায় রেখে কমিশন সঠিক দায়িত্ব পালন করেন যার বাস্তবতা আজও অনস্বীকার্য।

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার অদম্য বাসনাকে সম্মান জানিয়ে নতুন উদ্দীপনায় জনগণ আর্থ-সামাজিক তথা দেশ ও জাতি গঠনে আত্মনিবেদিত হলো। এ সময়ে গ্রাম-গঞ্জের ভাঙাচোরা, জ্বালিয়ে দেওয়া অথবা লুণ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলোকে দাঁড় করানোর আয়োজন শুরু হলো। বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে গণগ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। উপযুক্ত সময়ে যথার্থ পদক্ষেপ গৃহীত হয় বঙ্গবন্ধুর একান্ত নির্দেশে গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য। এতে প্রায় ২ কোটি ৪০ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর সরকার গণগ্রন্থাগারের উন্নয়নসহ বিশেষ গ্রন্থাগারগুলোকে মানসম্পন্ন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গুরুত্বারোপ করে। কারণ সদ্য স্বাধীন ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশকে দ্রুততম সময়ে গড়া ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও গবেষণা সমৃদ্ধ করার তাগিদ অনুভব করা হয়। বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, শিল্প-কারখানা, জাদুঘর প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারগুলোকে গড়ে তুলে একটি মানসম্পন্ন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাগাদা দেওয়া হয়। এর মধ্যে বিশেষ গ্রন্থাগারগুলো গণগ্রন্থাগার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার অপেক্ষা অধিকতর সচেষ্ট ও উন্নতমানের অধিকারী হয়ে উঠতে সক্ষম হয়। এগুলোই মূলত দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নিবে বলে বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন।

বঙ্গবন্ধুর এ বিশ্বাস ও ভাবনা থেকেই ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমির আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে বঙ্গবন্ধু প্রতি থানায় একটি গ্রন্থাগার স্থাপনের নির্দেশ

দিয়েছিলেন ডক্টর কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের উদ্ধৃতি দিয়ে। উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ডক্টর মাযহারুল ইসলাম। স্মর্তব্য যে, বঙ্গবন্ধুর বই পড়ার ক্ষুধা থেকে দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে তোলার অদম্য তাগাদা অনুভব করেছিলেন বলেই সদ্য স্বাধীন দেশে ধ্বংসপ্রাপ্ত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারসহ গণগ্রন্থাগারগুলোর পুনর্নির্মাণসহ নতুন নতুন গ্রন্থাগার স্থাপনের ওপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন গ্রন্থাগারিক মরহুম ফজলে এলাহীর প্রচেষ্টায় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম তিন মাসের সার্টিফিকেট কোর্স প্রবর্তিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কলা অনুষদের অধীনে। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ' প্রবর্তনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যক্রম চালু হয়। এটি ছিল ছয় মাসের একটি সার্টিফিকেট কোর্স। মোট চার কোর্স পর্যায়ক্রমে পরিচালিত হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৫৯-১৯৬০ ও ১৯৬২-১৯৬৩ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে যথাক্রমে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা এবং মাস্টার্স ডিগ্রি কোর্স চালু হয়। একই সময়ে ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের আদলে ১৯৫৯-১৯৬০ শিক্ষাবর্ষে এক বছর মেয়াদি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স উত্তীর্ণরা এক বছর মেয়াদি 'মাস্টার্স অব আর্টস' কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ তৈরি হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৬২-১৯৬৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে মাস্টার্স অব আর্টস কোর্স অত্যন্ত সফলভাবে শুরু হয়। ১৯৬৪-১৯৬৫ শিক্ষাবর্ষটি বাংলাদেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার দিগন্ত উন্মোচিত হয় উন্নয়নের মডেল হিসেবে। এই শিক্ষাবর্ষ থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান কোর্সটি স্বীকৃতিলাভ করে এবং 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ' হিসেবে কলা অনুষদের অধীনে পূর্ণাঙ্গ বিভাগ রূপে সংগঠিত হয়। ১৯৭৪-৭৫ খ্রিস্টাব্দে দুই মেয়াদি 'মাস্টার্স অব ফিলোসফি' (এমফিল) প্রোগ্রামকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট অনুমোদন দেয় এবং ১৯৭৫-১৯৭৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে কোর্স চালু হয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে 'ডক্টর অব ফিলোসফি' (পিএইচডি) প্রোগ্রামটিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট অনুমোদন দেয় ১৯১৭৮-৭৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে। ১৯৮৭-১৯৮৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে তিন বছর মেয়াদি গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে ব্যাচেলর অব আর্টস (বি এ অনার্স) ডিগ্রি হিসেবে অনুমোদনপ্রাপ্ত হয়। একই সময়ে তথ্য-প্রযুক্তির যুগের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বিভাগের নাম পরিবর্তন করে 'গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ' রূপে নামকরণ করা হয়।

১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম চালু করে। দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানী তথা বাংলাদেশ গ্রন্থাগারিক ও তথ্যায়নবিদ সমিতির দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৮-১৯৯৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক (পাশ) কোর্সে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ে ৪০০ নম্বরের অপশনাল বিষয় নেওয়ার সুযোগ প্রবর্তন করা হয়। তাছাড়াও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত তিনটি কলেজে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান অধ্যয়ন করার সুযোগ রয়েছে।

গ্রন্থাগার সমিতি

বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে গতিশীল করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ খুব একটা গৃহীত না হলেও দেশের গ্রন্থাগার পেশা ও পেশাজীবীদের দাবী-দাওয়া পূরণ ও উন্নয়নের জন্য কয়েকটি সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তন্মধ্যে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির (LAB) নাম উলেখযোগ্য। দেশের গ্রন্থাগার পেশা ও পেশাজীবীদের উন্নয়নের প্রয়োজনে 'বারগেইনিং প্লাটফর্ম' হিসেবে কতিপয় বরেণ্য ব্যক্তিত্ব ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। মোট ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি কার্যকরী পরিষদ সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি ও ট্রেজারার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে মরহুম মুহম্মদ সিদ্দিক খান, মরহুম রাকিব হোসেন ও মরহুম আবদুর রহমান মৃধা। এ-ছাড়াও আরও ১০ জন উক্ত কার্যকরি পরিষদে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে আরও কার্যকরী পরিষদ গঠিত হয় এবং তাঁরা পেশাগত দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু বাহ্যত তেমন কোনও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয় নি। পেশাগত ক্ষেত্রে বহুদিন পর্যন্ত একটি শূন্যতা ও সম্পূর্ণ নির্লিপ্ততা বিরাজ করছিল।

তথ্যপ্রযুক্তির মহাসড়কে প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতি

এখন বিশ্বে তথ্য একটি অপরিহার্য সম্পদ হিসেবে গণ্য। তথ্য-সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার ও বিতরণের ক্ষেত্রে নতুন তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার তথ্য-বিস্ফোরণের ভয়াবহতায় রূপান্তরিত হয়েছে 'তথ্য বিপ্লবে'। বস্তুত, তথ্যবিপ্লবের ফলেই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন বিশ্ব এখন পরিণত হয়েছে অখণ্ড বিশ্বপল্লীতে। তথ্য-প্রবাহের প্রক্রিয়ায় বিশ্ব এখন নিরবচ্ছিন্ন তথ্যগ্রাম হিসেবে স্বীকৃত। তথ্যসেবায় ব্যবহৃত কারিগরি জ্ঞান ও কলাকৌশল এখন তাই নতুন অভিধায় 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' হিসেবেই চিহ্নিত।

'তথ্য-প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নয়ন ও পৃষ্ঠপোষকতার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অফিস-আদালত বিশেষত গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রগুলোতে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' ব্যবহার করে তথ্য অনুসন্ধানের সুযোগ সৃষ্টি ও দ্রুত তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করেছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপনের মাধ্যমে আধুনিক তথ্য-ব্যবস্থাপনায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। অনলাইন নেটওয়ার্কিং পদ্ধতি তথ্য-ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটার-ভিত্তিক অনলাইন ও অফলাইন প্রযুক্তি এক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। অনলাইন নেটওয়ার্কিং পদ্ধতি তথ্য-বিস্ফোরণের ব্যাপক পরিমণ্ডলকে ছোটো করে নিয়ে এসেছে। আন্তর্জাতিক অনলাইন তথ্যভাণ্ডারে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তথ্যের মহাসড়কে বিচরণের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই বাংলাদেশ যুক্ত হয় তথ্যের মহাসড়কে তথা ইন্টারনেটের সঙ্গে। তখন থেকেই ডিজিটাল

রেফারেন্স থেকে পূর্ণ ডিজিটাল টেক্সটে প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। কতিপয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র দ্রুত এই সুযোগ নেওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং খুব অল্পসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার পূর্ণ ডিজিটাল টেক্সটে প্রবেশাধিকার প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে চাঁদা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এর আগে ঠিক ৮০-র দশকে 'তথ্যায়ন–একটি নতুন ধারণা' নিয়ে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবায় নতুন মাত্রা যোগ হয়। বিশেষত আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দেশীয় বিশেষ প্রতিষ্ঠানগুলো তথ্য-ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তথ্যায়ন-সেবার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সেবাগ্রহীতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। সংস্থাগুলো তথ্যায়ন-সেবাদানের আওতায় বিব্লিওগ্রাফিক্যাল সেবা যেমন কারেন্ট অ্যাওয়ারনেস, কন্টেন্ট অ্যানালাইসিস, এসডিআই, ডকুমেন্ট রিভিউ, ডকুমেন্ট রিপ্রোডাকশনসহ নানা রকম তথ্যায়ন-সেবায় নতুনত্ব আনয়ন করে।

উন্নয়নের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষের জীবনের প্রাত্যহিক সমস্যার সমাধানকে সহজ থেকে সহজতর করে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের কল্যাণসাধন করা। গণমানুষের প্রকৃত উন্নয়ন ব্যতিরেকে রাষ্ট্রীয় উন্নতির কোনও ফলাফলই আশাব্যঞ্জক হয় না। অনুভূতি ও মননের অভিব্যক্তি এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনকে উপলব্ধির জন্য এবং জাতীয় আর্থ-সামাজিক জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য দরকার গণমানুষের উন্নতিসাধন। গণমানুষ তাঁরাই, যাঁদের বসবাস গ্রামীণ জনপদে। এঁদের বোধ বা সত্ত্বাকে উপলব্ধির প্রয়োজনে তাঁদের হাতে তথ্য পৌঁছে দিতে হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাই চেয়েছিলেন গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপন করে সোনার মানুষদের দিয়ে সোনার বাংলা গড়তে।

বর্তমানে প্রায় প্রতিটি জেলা এবং উপজেলায় বেসরকারি গণগ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের এক জরিপে দেখা যায়, সারা দেশে প্রায় ১,৬০০ বেসরকারি গণগ্রন্থাগার আছে। তবে বেশিরভাগ গ্রন্থাগারের অবস্থা উন্নত নয়। দেশের ৩১টি সরকারি এবং ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার রয়েছে। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এখানে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। বর্তমানে এ-গ্রন্থাগারে গ্রন্থসংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ ৫০ হাজার এবং ৭৬ হাজার বাঁধাই সাময়িকী রয়েছে। এ-গ্রন্থাগারে প্রায় ৩শ জার্নাল আছে। দেশে ৭০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১২ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার রয়েছে। মাদ্রাসা-কেন্দ্রিক ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও গ্রন্থাগার রয়েছে।

সুপারিশ

১. দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্যায়ন ব্যবস্থা সুসংহতকরণের জন্য একটি সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অপরিহার্য;

২. 'ইউনেসকো'র এসডিজি-২০৩০, শিক্ষা এজেন্ডা-৪ বাস্তবায়নের জন্য বঙ্গবন্ধু-নির্দেশিত ডক্টর কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের আদলে গ্রন্থাগার ও তথ্যায়ন-সেবা সর্বস্তরে সহজলভ্য করা;

৩. প্রতি ইউনিয়নে একটি করে গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা যা একাধারে জ্ঞানের পাশাপাশি

তথ্যপ্রাপ্তি কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে;

৪. গ্রন্থাগারকে সম্পূর্ণ ডিজিটাল করা দরকার। গুগল-এর একটি মতো সহজলভ্য অনলাইন প্লাটফর্ম অতি অপরিহার্য;

৫. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান শিক্ষা পাঠ্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রন্ত ব্যবহারিক শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করা;

৬. গণগ্রন্থাগারের পরিসেবা কার্যক্রমকে গণমুখীন করার জন্য গণগ্রন্থাগারের আইন প্রবর্তন করা জরুরি;

৭. বিদ্যমান গণগ্রন্থাগারগুলোকে শীঘ্রই শিশুদের মননশীল, বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশ ও প্রযুক্তিভিত্তিক জ্ঞানচর্চার বিদ্যাপীঠ হিসেবে গড়ে তোলা দরকার।

পরিশেষে

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার সংগঠনের ইতিহাস সমৃদ্ধ। বিশ্বের অনেক উন্নত দেশের তুলনায় বাংলাদেশ এদিক থেকে অনেক বেশি ঐতিহ্যের অধিকারী। জাতির মেধা, মনন উন্নত করতে আর জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়তে গ্রন্থাগার অপরিহার্য। ডিজিটাল-গ্রন্থাগার আজ সময়ের দাবি। জাতিকে বিশ্বের দরবারে সম্মানের আসনে নিতে আর দেশকে আগামীর উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে গ্রন্থাগারের বিকল্প নেই। তাই আমাদের একটি সমন্বিত আর ডিজিটাল গ্রন্থাগারে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় আজই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।